মুফতে পাওয়া সুশাসন এবং ত্রিভুজ থেকে চতুর্ভুজ

ইমতিয়াজ আহমেদ

১.

গল্পের শুরুটা ভালোবাসা নিয়ে।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই বেবীর বিয়ের সম্মন্ধ আসতে লাগলো। একটি ছেলেকে তো বাড়ীর সকলে পছন্দই করে ফেললো। এদিকে তার তখন উথাল-পাথাল প্রেম চলছে আশিকের সাথে। আশিক একই কলেজে ডিগ্রী পড়ে। তাদের প্রেমের কথা বাসায় জানাতে আরও তাড়াহুড়ো করে বিয়ের দিন ঠিক করা হলো। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে বিয়ের আগের রাতে তারা দুজন বিয়ে করলো পালিয়ে গিয়ে। বেবীর প্রভাবশালী পরিবারের ভয়ে তারা চলে আসলো রাজধানীতে। এক বন্ধুর চেষ্টায় আশিক খুব কম বেতনের হলেও একটা চাকরীও পেয়ে গেলো।

বছর খানেক পরের কথা। আশিক অফিস থেকে ফিরছিল। রাত নটা-সাড়ে নটার মত। আলো-আঁধারিতে গুলিস্তানে গোলাপ শাহ মাজারের কাছে আসতে তাকে পিছন থেকে নরম স্বরে কেউ একজন ডাকলো। সে পিছনে তাকিয়ে দেখে, ত্রিশের কাছাকাছি বয়সের তরুণ। চেহারা ও পোষাক-আশাকে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত মনে হয়। বললো, ভাই, একটা শাড়ী বিক্রি করবো। ইন্ডিয়ান বেনারশী। আমার বউএর বিয়ের শাড়ী। আমার মেয়েটার খুব অসুখ। খুব জরুরী কিছু টাকা দরকার।

আশিকের বিয়ে হয়েছে পালিয়ে। হাজার বাতির অনুষ্ঠান নেই, ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ী নেই, সানাই এর বাজনা নেই, নেই লাল বেনারসীও। কাজী অফিসে বেবীর পরণে ছিল সেলোয়ার কামিজ। তাতেই বাসর। লাল বেনারসীতে তার সোনা রং এর বউ এর ছবিটি মনে আসতেই সে এতো দামী শাড়ি কেনার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না। লোকটি জানালো, শাড়ীটি কিনেছে দুই বছর আগে, দশ হাজার টাকা দিয়ে। এখন দুই হাজারে দিয়ে দিবে।

দশ হাজারের শাড়ী দুই হাজারে, একদিন মাত্র পরা হয়েছে। আশিকের মনে হলো তাদের প্রেমের প্রতিদান হিসাবে ভাগ্য তাকে নিজ হাতে শাড়ীটি পাঠিয়েছে। কিন্তু তার পকেটে তখন মাত্র শ'পাঁচেক টাকা। লোকটা পাঁচশতেই শেষ মেশ রাজী হয়ে গেল।

গাদাগাদি মিনিবাসে শাড়ীর প্যাকেটটি আকড়ে ধরে আশিক সারা পথ কল্পনায় ভাসতে থাকলো।

বাসায় ফিরে একটু ভনিতা করেই শাড়ীর প্যাকেটটা বেবীকে দিল সে। প্যাকেটের ঢাকনা খুলে বেবী হায় হায় করে উঠলো। বেনারসী বটে, কিন্তু বহু পুরানো শতছিন্ন। প্যাকেটের উপরে যে অংশটি ছিল, শুধু সেটুকুই কিছুটা অক্ষত।

গল্পটি শেষ করা যাক ঈশপের স্টাইলে উপদেশ দিয়ে। এক্ষেত্রে উপদেশটি হচ্ছে, কম মূল্যে দামী কিছু পেতে গলে ঠকতে হয় এবং বিপদে পড়তে হয়। কতটুকু ঠকবেন বা কতটুকু বিপদে পড়বেন তা নির্ভর করে কত দামী জিনিস কত কম মূল্যে পেতে চান তার উপর।

২.

নব্বই এর শুরুতে ব্যাপক ও সফল গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন ঘটার পর কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সর্বজন প্রশংসিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করলে সকলেই ভেবেছিলেন, গণতন্ত্রের পথে এই যাত্রা আর কখনও হোঁচট খাবে না। পর পর তিনটা নির্বাচন যখন সুষ্ঠুভাবে হয়ে গেলো, তখন মনে হয়েছিল অনির্বাচিত সরকারের ক্ষমতায় আসার আর কোন সম্ভাবনা নেই। রাজপথে আন্দোলন ছিল, হরতাল-অবরোধ ছিল, তবুও জিডিপি বৃদ্ধির হার সাত ছুঁই ছুঁই করেছে। দারিদ্রের হার কমেছে বছরে দুই শতাংশ হারে, স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের সংখ্যা তো ছাত্রদের ছাড়িয়ে গেছে। মানব উন্নয়নের সূচকগুলোতে ইন্ডিয়াকে অনেক পিছে ফেলে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। তেল-গ্যাস বিক্রির জন্য পশ্চিমা দেশ ও ঋণদাতা সংস্থাগুলোর সকল দাবী ও চাপকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে সরকারগুলো।

গণতন্ত্র, স্থিতিশীলতা, মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে যখন বাংলাদেশ এগিয়ে চলছিল, তখন ভিতরে ভিতরে চলছিল আরেকটি প্রস্তুতি।

ক. পত্র-পত্রিকাগুলোকে ধীরে ধীরে দিয়ে অবঃদের মুখপাত্রে পরিণত করা হতে থাকলো। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ডজন ডজন বিশ্লেষকের আবির্ভাব ঘটতে লাগলো। তাদের কলাম সংগ্রহের জন্য সম্পাদকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। জাতির মননের আমলাকরণ ও সামরিকীকরণে এই কলামগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা খুব সাফল্যের সাথে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে প্রচার করেছে, এর জন্য রাজনীতিক দল ও নেতৃত্বকে দায়ী করেছে এবং অগনতান্ত্রিক শাসনের দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করেছে।

খ. বিগত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে অনেকগুলো নতুন টিভি চ্যানেলের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পায়। সেক্যুলার ধারার বাহক দাবীদার চ্যানেলটি অসংখ্যবার একজন পতিত স্বৈরাচারকে তার তরুণী ভার্যাসহ দাওয়াত দিয়ে এনে মহিলার নিকট প্রশ্ন করেছে, তিনি কি খেতে পছন্দ করেন। পতিত স্বৈরাচার, তার সহযোগী, হেরেমবাসী ও আত্মীয় স্বজন, অবসরপ্রপাপ্ত আমলা ও সামরিক কর্মকর্তা, গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতিকদের মুখপাত্রে পরিণত হলো টিভি চ্যানলগুলো । গণবিচ্ছন্নতাকে যে কিভাবে মিডিয়া কভারেজের মানদন্ডে পরিণত করা হলো তা তৃতীয় মাত্রা বা অন্যান্য টক শো গুলোর আমন্ত্রিত অতিথিদের পরিসংখ্যান নিলেই বোঝা যাবে।

গ. তৃতীয় শক্তিকে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রলুব্ধ করতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, রাজনীতিকেরা ব্যর্থ হলে তৃতীয় শক্তি ক্ষমতা দখল করবে।

ঘ. বিদেশী অর্থে পরিচালিত কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নানা রকম হিসাব নিকাশ কষে বাংলাদেশের সকল অর্জনকে মিথ্যা প্রমাণ করার কাজে লেগে গেলো।

একটি মাস্টার প্লানের আওতায় একদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ব্যর্থ প্রমাণিত করা হলো অপরদিকে তৃতীয় শক্তির জন্য পথ তৈরী করা হলো এবং তাদেরকে ক্ষমতা দখলে প্রলুব্ধ করা হলো। পাশাপাশি এমন সুশাসনের স্বপ্ন দেখানো হল যার জন্য অরাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজন।

গুলিস্তানের বেনারসীর মত সুশাসনের স্বপ্নগুলো খুব লোভনীয় ছিল। ওয়াল্ড ব্যাংক হিসাব করে বের করলো, দুর্নীতিতে আমাদের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় অর্ধেক এবং জিডিপির ২-৩ শতাংশ নষ্ট হয়। এই ব্যাপক দুর্নীতি যদি রোধ করা যায় তাহলে বাংলাদেশের জিডিপি দুই ডিজিটে পৌঁছে যাবে। তার সাথে যদি সোনায় সোহাগার মত যোগ হয় যোগ্য নেতৃত্বের শাসন, তাহলে বাংলাদেশ তরতরিয়ে উপরে উঠে যাবে। দুর্নীতি থাকবে না, পুলিশ চোর-ডাকাতদের এতো হেদায়াত করবে যে রাস্তায় ব্রীফকেস ভর্তি টাকা খোলা পড়ে থাকলেও কেউ ফিরে তাকাবে না। দারিদ্র মউিজিয়মে চলে যাবে, শিক্ষা ও কাজের জন্য আমেরিকান আর সৌদিরা বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। প্রত্যন্ত গ্রামের স্বাস্থ্যবতী ধানের ক্ষেত চিরে তৈরী পিচ ঢালা রাস্তায় বহুতল বিল্ডিং থেকে সা করে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশে তৈরী গাড়ী। ইউরোপ-আমেরিকার মত কার্যকরী ও পরিপূর্ণ বিকশিত গণতন্ত্র রাত পোহালেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

৩.

অবশেষে সেই বহু প্রতিক্ষীত সুশাসন আসলো। সুমনের গানের মত ক্ষমতাশীনেরা সকলে কোরাস গাইতে লাগলেন, ‘এমন দিন এনে দেবো ..’। রাজনীতিকেরা যে দেশের কতটা সর্বনাশ করেছেন তা প্রতিদিন তারা ও তাদের সহযোগী মিডিয়া নতুন নতুন করে আবিস্কার করতে লাগলো এবং সমস্বরে আক্ষেপ করতে লাগলো যে, ছত্রিশ বছরে কিছুই হয় নি। আরব্য রজনীর থেকেও রোমঞ্চকর কাহিনী বেরিয়ে আসতে থাকলো পূর্ববর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের দুর্নীতি সম্পর্কে। বিদ্যুৎ খাতের সাড়ে তের হাজার টাকা মোট বাজেট থেকে কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন ইত্যাদি খরচের পরও নাকি বিশ হাজার কোটি টাকা শুধু বিদেশেই পাঁচার হয়েছে। ভাগ্য ভালো যে, গণিতের এই নতুন থিওরী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি

সব সরকারেরই একটা হানিমুন পিরিয়ড থাকে। এ ধরণের মনোনীত ও জরুরী সরকারের হানিমুন পিরিযডটি একটু বেশী মাদকতাময় হওয়াটাই স্বাভাবিক। রাজনীতিকেরা ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থাকেন। একজন পাড়ার নেতাও ভাবে সে মন্ত্রী হবে। তার বক্তৃতায়ও হাজার হাজার মানুষ শ্লোগান তোলে, তাকে নিয়ে জয়ধ্বনি করে। রাস্তায় বের হলে লোকে আলাদা সম্মান করে। ফ্লাগওয়ালা গাড়ী না থাকলেও তারা শুরু থেকেই জনগণের নেতৃত্বের ক্ষমতার একটা স্বাদে অভ্যস্ত থাকে। কিন্তু যখন ছাপোষা কিছু লোকের বাসায় হঠাৎ বহু উপর থেকে ফোন যায়, ফ্লাগওয়ালা গাড়ী যায়, টিভি ক্যামেরা ঘিরে ধরে, তখন তাদের কি অবস্থা ঘটে তা সহজেই অনুমেয়। সাথে জরুরী অবস্থা যোগ হয়ে তাদের হানিমুনকে আরো মাদকতাময় করে তোলে। আপনি যা ইচ্ছা করেন, কেউ কিছু বলবে না, সাংবাদিকরা কোন বেয়াড়া প্রশ্ন করবে না, কোথাও কোন মিছিল বের হবে না। একদিকে জরুরী অবস্থার তলোয়ার সকলের ঘাড়ের এক ইঞ্চি উপরে, অপরদিকে মিডিয়া জগতের ‘অগ্রসর’, ‘অভিজাত’ ও ‘সর্বাধিক প্রচারিত’ অংশটি শুধু সরকারের শর্তহীন সমর্থকের ভূমিকাই পালন করেনি, বরং তারা এ সরকারকে ক্ষমতায় আনার প্রকাশ্য দাবীও করেছে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ বোধ হয় আর হয় না। এমন ক্ষমতার মধ্যে মতিভ্রম না হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক।

হয়েছিলও তাই। ‘বুল ইন এ চায়না শপ’ সব কিছু এলোমেলো করে দিল, গরীব মানুষের বস্তিগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল, দোকান-পাঠ, বাজার-ঘাট কোনটাই অক্ষত থাকলো না। মাসখানেকের মধ্যে সারা দেশ অনেকটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত রূপ নিল। কৃষক সার পেলো না, বীজ পেলো না। বেপরোয়া গ্রেফতারে বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হলো। রাস্তার হকারদেরকে মেরে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হলো। ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিলো আর কেউ বা সব ছেড়ে বাড়ীতে বসে থাকা নিরাপদ বোধ করলো।

পরিচিত এক তরুণ পোলট্রি ফুড সাপ্লিমেন্টের ব্যবসা শুরু করেছিল ২০০৬ এর অক্টোবরে। বিশ্ময়কর হচ্ছে, সেই অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যেও তিন মাসে তার ব্যবসা দাড়িয়ে গিয়েছিল এবং সে ব্রেক ইভেনে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন ওয়ান ইলেভেন আসলো। চারিদিকে ধড়-পাকড় হচ্ছে। রাজনীতির সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক যাদের ছিল তারা ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোন ছুতোয় কাকে ধরা হবে কেউ জানে না। যেহেতু রাজনীতির অর্থের সিংহভাগ আসে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, তাই তারাও ছিল টার্গেট। সে নিতান্ত ছোট ব্যবসায়ী। দুর্নীতির সীমানায় ঢোকার সুযোগ তখনও তার আসে নি। কিন্তু, বাসার সবাই বললো ব্যবসায়ের থেকে জীবনের মূল্য অনেক বেশী। কে জানে আইনের কোন ফাঁকে কে কখন আটকে যায়। ব্যবসা করতে হলে কত ধরণের লাইসেন্স লাগে। কত ধরণের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। কে জানে সব লাইসেন্স আছে কিনা, সব নিয়ম সঠিকবাবে মানা হয়েছে কিনা। চাকুরী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত বাঙ্গালী এমনিতেই ব্যবসাতে ভয় পায়। তার সাথে যোগ হলো থানা-পুলিশ আর রিমান্ডের ভয়। তিন মাস সব বন্ধ। তারপর যখন ফের শুরু করার মত সাহস হলো, তখন রিমান্ডে না গিয়েই তার মেরুদন্ড ভেঙ্গে গেছে।

মধুচন্দ্রিমার মাদকতা থেকে জেগে উঠে বিষয়টি বুঝতে বুঝতে কর্তাদের অনেক সময় লেগে গেলো। যখন তাঁরা বুঝলেন যে জনগণের সুশাসনের মোহ কেটে যাচ্ছে এবং তারা পূববর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের সাথে তাদের তুলনা শুরু করেছে, তখন তারা জুজুর ভয় দেখানো শুরু করলেন। বলা শুরু করলেন, জনগণ আর ওয়ান ইলেভেনের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চায় না।

কথাটা কতটুকু সত্য? ওয়ান ইলেভেনের আগে মানে কি শুধুই ১০ জানুয়ারী ২০০৭? যদি এমন কোন টাইম মেশিন থাকতো যা পুরো জাতিকে পিছনের কোন একটি দিনে নিয়ে যেতো, তাহলে আমরা কি ওয়ান ইলেভেনের আগের কোন তারিখেই ফিরে যেতে চাইতাম না? যেমন, ১০ জুলাই ২০০৬ তারিখে ফিরে যাবার কোন সুযোগ যদি দেয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের কতজন রাজী হবে? কমপক্ষে ৭০ শতাংশ। আজ চালের কেজি কত আর সেদিন কত ছিল? আজ চালের মজুদ কত আর সেদিন কত ছিল? বাংলাদেশের জব সাইটগুলোতে আজ কয়টা চাকুরীর বিজ্ঞাপন রয়েছে আর সেদিন কতগুলো ছিল? আজ সারের সরবারহ কেমন আর সেদিন কেমন ছিল? আজ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কেমন আর সেদিন কেমন ছিল? বাংলাদেশে বন্যা এই প্রথম হচ্ছে না। এই সুশীল ও যোগ্য লোকদের সরকার এক বন্যাতেই দুভিক্ষাবস্থা এনে দিল। অথচ, আগের 'অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ' সরকারগুলো তো হেসে খেলে এর থেকে অনেক বড় বন্যা মোকাবেলা করে গেছে। কর্তারা যে বিষয়টি বুঝছেন না, তা নয়। বুঝছেন বলেই এখন তারা ত্রিভুজ-চতুর্ভুজের খেলা খেলছেন (৪ নম্বর দ্রষ্টব্য)।

৪.

টিভি চ্যানেলগুলোর গত ২৪ জানুয়ারীর সন্ধ্যার খবর এবং পরদিন সরকালের পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতা দেখে অনেকেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হামিদ কারযাই এবং পারভেজ মোশাররফের সাথে হাত ধরাধরি করে গদগদ চেহারায় আমাদের প্রধান উপদেষ্টা। হামিদ কারযাই নামটি এদেশে যে মীর জাফরের স্থান নিয়ে নিয়েছে তা কি ক্ষমতাশীনেরা জানেন না? আমেরিকার পুতুল হিসাবে পরিচিত হতে ভদ্রলোকের যে কোন আপত্তি নেই তা পরদিনের পত্রিকাতেও প্রথম পাতার খবরে এসেছে। গণতন্ত্র, বিচার বিভাগ, মানবাধিকার - সবকিছুকে বুটের তলায় পিষ্ট করার পরও যেহেতু আমেরিকা তার থেকে বড় স্বার্থরক্ষক আর পাচ্ছে না তাই বহাল তবিয়তে রয়েছেন

পারভেজ মোশাররফ। এই পাপেট ত্রিভুজের এক বাহু হিসাবে নিজেকে প্রচার করার আগে প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর বুদ্ধিদাতারা একবারও কি ভেবে দেখলেন না? নাকি এটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত?

সন্দেহটি গাঢ় হয় পরদিনের টিভি নিউজে। ওয়াল্ড ইকোনোমিক ফোরামের সম্মেলনের স্থলে চারটি দেশ - আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে ইরাককে এক স্টেজে বসিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি করা হয়। সেখানে আবার পারভেজ মোশাররফ ফখরুদ্দীনকে প্রশংসা করেন ও তাঁকে সাফল্যের সার্টিফিকেট দেন। বাংলাদেশকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পর এবার ইরাকের কাতারে নিয়ে আসা হলো।

এই ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ তৈরী যে সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে এবং তাতে যে ক্ষমতাশীনদের সায় ছিল, তা বোঝা যায় সরকারী টিভি চ্যানেল বিটিভি খবরটি যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে তা থেকে।

প্রশ্ন হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে দেশ ও সরকারপ্রধানকে এতো নীচে নামানোর উদ্দেশ্য কি? একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বাংলাদেশের জনগণ উভয়ের জন্যই বার্তা রয়েছে। পশ্চিমাদের প্রতি বার্তাটি পরিস্কার, 'কারযাই, মোশাররফ এবং জালাবির মত আমাকেও গ্রহণ করো প্রভূ'। আর বাংলাদেশের জনগণকে বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে, তোমরা কিছু করার আগে চতুর্ভুজের অপর বাহুগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। বেনজির ও নওয়াজ শরীফ এক হয়েও পারভেজকে নামাতে পারে নি, উল্টো বেনজিরকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হলো। পাকিস্তান ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও এবং সেখানে রক্তের বন্যা বয়ে গেলেও পারভেজ মোশাররফ থাকবে; বাগদাদের বাতাস লাশের গন্ধে যতই ভারী হোক না কেন জালাবিদেরকে টলানো যাবে না যতক্ষণ আমেরিকার আশীর্বাদ তারা পাবে। ফলে, যখন ধর্ষণ ঠেকাতে পারবে না, তখন তাকে উপভোগ করো। (বাণী চাইনিজ)

কর্তা ব্যক্তিরা বুঝে গেছেন, জনগণ ফিরে যেতে যাচ্ছে। তাদের সুশাসনের স্বাদ মিটে গেছে। এ অবস্থাটি মারাত্মক। এ ধরণের পরিস্থিতিতে ক্ষমতাশীনেরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, জনগণকে ভয় ও অবিশ্বাস করতে থাকে, বিদেশী শক্তিগুলোর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের মন্ত্রণায় একের পর এক ভুল করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কখনও কখনও যে কত মারাত্মক পদক্ষেপ নেয়া হয় পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তার উদাহরণ। তাই, সময় থাকতেই সকলকে সাবধান হতে হবে। এখনও যদি সরকার ও নির্বাচন কমিশন সকল টাল বাহানা বাদ দিয়ে সুষ্ঠু, প্রভাবহীন ও মুক্ত নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে দেয় তাহলে জনগণ তাদের সব ভালো কাজের মর্যাদা দেবে এবং সকল ভুল ভ্রান্তি মাফ করে দেবে। অপরদিকে, বাংলাদেশকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা ইরাক বানানোর চেষ্টা যে সফল হওয়া কতটুকু অসম্ভব, তা বুঝতে কাউকে ইতিহাসবিদ হতে হয় না।